Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation After 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম এবং তার বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের এক স্মরণীয় শতক বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে নানা কারনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাদের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা থেকে এশিয়াও বাদ যায়নি। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের শাসন ও শোষণ কে কার্যকর করেছিল। এশিয়ার পদানত ও শোষিত জনগণ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য বিংশ শতকে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। বিংশ শতকের চতুর্থ শতক পর্যন্ত এশিয়ার বহু মানুষ পরাধীন ছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে পদানত এশিয়ার সকল অংশে একই সময়ে জাতীয়মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়নি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পিছনে জাতীয়তাবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এশিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। কিন্তু এশিয়ার সর্বত্র একসাথে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদী প্রেরনায় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পটভূমিকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু হলেও এই আন্দোলনের কিছু সাধারন বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি হল নিম্নরূপ-

প্রথমত – এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল জাতীয়তাবাদী উন্মেষ। এই জাতীয়তাবাদের পিছনেও কিছু কারন সক্রিয় ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এশিয়ার উপনিবেশগুলিকে আর্থিক দিক থেকে নির্মম ভাবে শোষণ করছিল। তাদের দমনমূলক নীতি ও সাধারন মানুষের প্রতি কঠোর ব্যাবহার পরাধীন জাতিগুলিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

দ্বিতীয়ত – এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি।

সব দেশেই এই শ্রেণী শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব সাধারন মানুষের হাতে ছিল না। ভারত, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

তৃতীয়ত – এশিয়ার জাতীয়মুক্তি আন্দোলন ছিল সাধারণত শহরকেন্দ্রিক। শহরের জনগণ ছিল রাজনীতির দিক দিয়ে সচেতন এবং পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠলে সব শ্রেণীর মানুষ এতে যোগ দিয়েছিল। কৃষক, শ্রমিক সহ সাধারন মানুষ এই গণআন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলনের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা ছিলনা। আন্দোলন এককভাবে শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়নি। আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

চতুর্থ – এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আদর্শগত পার্থক্য কে অস্বীকার করা যায় না। ভারত, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নেতারা। তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু তারা সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন চাননি। কিন্তু চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের নেতৃত্ব একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম করছে তেমনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আর্থিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করেছে।

পঞ্চমত – এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে ঐক্যের এক সাধারন সুর লক্ষ্য করা যায়। এশিয়ার এক দেশ অন্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। ভিয়েতনাম, চীন, কোরিয়া জাতীয় সংগ্রামে পরস্পরকে সাহায্য করেছিল।

ষষ্ঠত – এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জোটনিরপেক্ষতা নীতি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এশিয়া থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দীর্ঘ পরাধীনতার পর ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল। তবে সেই স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত স্বাধীনতা। ঐক্যবদ্ধ ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরের বছর শ্রীলঙ্কা ও বার্মার স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়াতে মালয় ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। মালয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুর এবং আরও দুটো ছোট ব্রিটিশ অঞ্চলকে যুক্ত করে ১৯৬৩ সালে মালেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর মালেশিয়া থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয় ও সিঙ্গাপুর স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছিল কিন্তু ব্রহ্মদেশ যোগ দেয়নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ও হল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিনসের স্বাধীনতা কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু হল্যান্ড ও ফ্রান্স সহজে তাদের উপনিবেশগুলি থেকে চলে আসতে রাজি হয়নি। পরিণতিতে ইন্দোনেশিয়াতে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং ইন্দো-চীনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। জাপানের আত্মসমর্পনের পরে সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ সালে ১৭ই আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হল্যান্ড এই স্বাধীনতাকে মানে নি। হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়াতে শুরু হয়েছিল রক্তাক্ত সংগ্রাম। বিশ্বের নানা দেশ ডাচদের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছিল। রাষ্ট্রসংঘ হল্যান্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ইন্দো-চীন ছিল ফ্রান্সের দখলে। ইন্দো-চীনের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির দ্বারা ইন্দো- চীনের তিনটি রাজ্যের ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ফরাসী কতৃত্ব শেষ হলেও এই অঞ্চলে মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কমিউনিস্টদের উচ্ছেদকরণ ছিল মার্কিনীদের লক্ষ্য। তারা অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধিতার দ্বারা চালিত হয়ে ভিয়েতনামের শান্তিকে নষ্ট করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ও গণতন্ত্রী চীনের সাহায্যে কমিউনিস্টরা এখানে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভিয়েতনামের জাতীয় আন্দোলন সফল হয়েছিল কিন্তু ভিয়েতনামে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এসেছিল একথা বলা যাবে না। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কোরিয়ার দ্বিখণ্ডীকরণ, নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলের উদ্ভব এশিয়ার রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের দাপটেরই ইঙ্গিত দিয়েছে।

এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমাপ্তি হয়নি। প্যালেস্টাইনে আরবদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবী এখনও অর্জিত হয়নি। কোরিয়ার ঐক্য সাধনও হয়নি। এশিয়ার অনেক দেশই নামে স্বাধীনতা পেয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া বা সৌদিআরবে এখনও যেভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের দাপট রয়েছে তাতে তাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

নয়াউপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এশিয়ার দেশগুলি কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন নতুন কৌশলে এশিয়ার উপর তাদের প্রভুত্বকে কায়েম রেখেছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে ইন্ধন জুগিয়ে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নষ্ট করে

দিয়েছে। ভারত – পকিস্তান দ্বন্দ্ব তার প্রমান। একই ভাবে ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় সংকট এশিয়াকে বিপদে ফেলেছে। এশিয়ার সব দেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হয়নি। পাকিস্তান, আরব, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সামরিক জোটে যোগ দিয়েছে। এশিয়ার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত।

এশিয়ার অনেক দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরও নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারেনি। পরাধীনতার ঐতিহ্য থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থাও তৈরি হয়নি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বহু দেশ তাদের দুর্বলতা কে দূর করতে পারেনি। অনেক দেশ বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীল। ঋণ, বানিজ্য ঘাটতি, সামরিক ব্যয়বৃদ্ধি এশিয়ার অনেক দেশকে অসহায় করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে।